# ভূমিকা

আমাদের গবেষণার বিষয়বস্তু হল "হুগলী নদীর তীরবর্তী দুই শহর -- চুঁচুড়া ও চন্দননগর (১৬৩২ -- ১৮২৫) — একটি আর্থ - সামাজিক পর্যবেক্ষণ"। এই বিষয়বস্তুটিকে আমরা বেছে নিয়েছি এ কারণে যে, ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মোঘলদের হাতে হুগলীতে অবস্থিত পোর্তুগীজ শক্তি পরাস্ত হলে ওলন্দাজরা সেই সুযোগে চুঁচুড়ায় বসবাস শুরু করে এবং ব্যবসা বাণিজ্যে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। এই সময় থেকে ওলন্দাজরা চুঁচুড়াকে কেন্দ্র করে বাংলায় প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বীহীনভাবে বাণিজ্য করতে থাকে। তবে পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলায় ইংরেজদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে ওলন্দাজদের বাণিজ্যে ভাঁটা পড়ে এবং ১৭৮১ - ৮৩ খ্রীষ্টাব্দ এবং ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ -- ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ — এই দুইবার চুঁচুড়া ইংরেজদের অধিকারে আসে। এরপর ওলন্দাজরা পুনরায় চুঁচুড়া ফিরে পেলেও ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে পাকাপাকিভাবে ইংরেজদের কাছে হস্তান্তরিত হয় এবং চুঁচুড়ায় ওলন্দাজ আধিপত্যের অবসান ঘটে। অন্যদিকে ওলন্দাজদের আগমনের প্রায় চার দশকের ব্যবধানে ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীরা চুঁচুড়ার দক্ষিণে চন্দননগরে আসে এবং ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মোঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের ফরমান অনুসারে চন্দননগরে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করে।

ইতিমধ্যে চুঁচুড়াকে কেন্দ্র করে ওলন্দাজদের বাণিজ্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। তবে ফরাসীদের বাণিজ্য তখনও সেভাবে জমে ওঠেনি। কিন্তু প্রায় সমসাময়িক দুটি ইউরোপীয় শক্তি হুগলী নদীর পশ্চিমতীরে পাশাপাশি বসতি স্থাপন করে নিজেদের বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যেতে থাকে। উভয় শক্তির মধ্যে বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও সামাজিক ক্ষেত্রে অবাধ মেলামেশা চলত, যেহেতু উভয়েই ইউরোপীয় শক্তি ছিল। চুঁচুড়ার মতো চন্দননগরও বেশ কিছুকাল, বিশেষতঃ ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের বেশীরভাগই ব্রিটিশ অধিকারে ছিল।

স্বাভাবিকভাবেই এ প্রশ্ন অনেকের মনে আসতেই পারে যে, এই বিষয়টিকে কেন আমরা গবেষণার বিষয়বস্তু হিসাবে বেছে নিলাম। এর কারণ সম্পর্কে বলা যায় যে, ওলন্দাজদের বাংলার গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি চুঁচুড়াকে নিয়ে গবেষণা ধর্মী রচনা যেমন এখনও প্রকাশিত হয়নি, তেমনি চুঁচুড়া সংলগ্ন ফরাসী শাসনাধীন চন্দননগরের আর্থ-সামাজিক ইতিহাস নিয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণাও হয়নি। তাছাড়া বর্তমানে ভারতীয় ইতিহাস চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা হিসাবে আঞ্চলিক বা স্থানীয় ইতিহাস রচনার উপরও বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। তাই এই বিষয়টি গবেষণার দাবী রাখে।

সুতরাং লাগোয়া দুটি শহরে দুই ইউরোপীয় শক্তি বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে কী ধরণের প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়েছিল, উভয়ের বাণিজ্যিক নীতির মধ্যে কোনো সাদৃশ্য বা স্বাতন্ত্র ছিল কিনা, উভয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় কী না, বাংলার রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তারা কি ধরণের নীতি গ্রহণ করেছিল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে তাদের মধ্যে আদান-প্রদান বা মেলামেশার কতটা সুযোগ ছিল এবং উভয়ের স্থাপত্যশৈলীর মধ্যে কোনো সাদৃশ্য ছিল কী না ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে গবেষণা করা খুবই জরুরী।

চুঁচুড়াতে ওলন্দাজ উপনিবেশ এবং চন্দননগরে ফরাসী উপনিবেশ ছাড়াও ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে চুঁচুড়ার উত্তর ও দক্ষিণে অনেক বিদেশী শক্তি উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। এগুলির মধ্যে হুগলীতে পোর্তুগীজ উপনিবেশ, ভদ্রেশ্বরে জার্মান, শ্রীরামপুরে দিনেমার, কোন্নগরে অস্ট্রেলীয়, রিষড়ায় গ্রীকরা উপনিবেশ স্থাপন করে। এসম্পর্কে সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'কোতরং' নামক ছড়ায় আছে ঃ-

"হাঁসের প্রিয় গুগ্‌লি,
পোর্তুগীজের হুগলী।
গুণীর প্রিয় তানপুরা,
ওলন্দাজের চিনসুরা।
চোরের প্রিয় আঁধার ঘর,
ফরাসীদের চন্নগর।

শিশুর প্রিয় চানাচুর,
দিনেমারের সিরামপুর।
লোকের প্রিয় ভোট রং,
পিতৃকুলের কোতরং"।

চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদের এবং চন্দননগরে ফরাসী শাসন সম্পর্কে আলোচনার আগে চুঁচুড়া ও চন্দননগরের ভৌগোলিক অবস্থান ভালভাবে জানা দরকার। বিভিন্ন ধ্রুপদী সাহিত্যে প্রাচীন বঙ্গ দেশের বিভিন্ন জনপদের নাম পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পুন্ড্র, গৌড়, বরেন্দ্রী, রাঢ়, সুহ্ম, তাম্রলিপ্তি, সমতট, বঙ্গ, বঙ্গাল, হরিকেল ইত্যাদি। তবে প্রাকৃতিক দিক থেকে বঙ্গ দেশ যে ৪টি ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল সেগুলি হল পুন্ড্রবর্ধন, বর্ধমান, বঙ্গ, এবং সমতট। চুঁচুড়া ও চন্দননগর হল ভাগীরথী নদীর পশ্চিমাংশে বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত রাঢ় জনপদের মধ্যে অবস্থিত হুগলী জেলার একটি প্রাচীন বিখ্যাত শহর। তাই চুঁচুড়া ও চন্দননগর সম্পর্কে জানতে হলে রাঢ় জনপদের অবস্থান সম্পর্কিত ধারণা লাভ আবশ্যিক।

'রাঢ়' শব্দের উৎপত্তি এবং রাঢ় জনপদের অবস্থান সম্পর্কে অনেক বিতর্ক আছে। তবে চুঁচুড়ার অবস্থান বোঝানোর জন্য যেটুকু আলোচনা প্রয়োজন সেটুকুই করা হল। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে প্রাচীন জৈন গ্রন্থ 'আয়াঙ্গার' বা 'আচারাঙ্গ সূত্র'-তে রাঢ় শব্দের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে যে চব্বিশতম তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীর খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে রাঢ় জনপদে এসেছিলেন ধর্ম প্রচারের জন্য। পঞ্চম শতকে সিংহলি পালি গ্রন্থ 'মহাবংশ'-তে 'লার' নামে, নবম শতকে ধর্মপালের সংস্কৃত তাম্র শাসনে 'লাট' নামে এবং একাদশ শতকে তামিল ভাষায় উৎকীর্ণ রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় শিলালিপিতে 'লাঢ়' নামে পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখ আছে। 'বাঁকুড়া' নামক গ্রন্থে তরুণদেব ভট্টাচার্য বলেছেন যে, ভাগীরথী নদীর পূর্ব দিকে নাবাল বা নিম্নভূমি। পশ্চিমে রাঢ় অঞ্চল। পূর্বের সমতল ভূমি অপেক্ষা পশ্চিমের রাঢ় অঞ্চল অনেক বেশী পুরানো। ভৌগোলিক সীমারেখায় রাঢ়ের পরিচয় ভাগীরথীর পশ্চিমতীর থেকে ছোটনাগপুরের মালভূমি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা।

খ্রীষ্টীয় নবম - দশম শতক থেকেই রাঢ়ের দুটি বিভাগ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে -- উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়, যা ছিল মূলত জৈন 'আচারাঙ্গ সূত্র' নামক গ্রন্থে উল্লিখিত বজ্জ বা বজ্র ভূমি এবং সুব্ভ বা সুহ্ম ভূমি। একাদশ শতকে চোল রাজ রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপিতে উত্তীর লাঢ়ম (উত্তর রাঢ়) এবং তক্কন লাঢ়ম (দক্ষিণ রাঢ়) -- এই দুটি নাম একত্রে পাওয়া যায়। এছাড়া ভোজবর্মার বেলাব লিপি, বল্লাল সেনের নৈহাটী পট্টোলী, লক্ষণ সেনের শক্তিপুর পট্টোলী, য়ুয়ান্ চোয়াঙের বিবরণ এবং 'ভবিষ্যপুরাণ' -এর ব্রহ্মখন্ডের বিবরণ থেকে মনে হয় যে, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর পশ্চিম অংশ অর্থাৎ কান্দি মহকুমা, সমগ্র বীরভূম জেলা (সাঁওতাল ভূমি সহ) এবং বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার উত্তরাংশ নিয়ে উত্তর রাঢ় গঠিত। অজয় নদীই ছিল উত্তর রাঢ়ের দক্ষিণ সীমা এবং দক্ষিণ রাঢ়ের উত্তর সীমা। তবে ষোড়শ শতকে দক্ষিণ সীমা দাঁড়ায় দামোদর নদ। আর বেশীরভাগ তথ্য প্রমাণ সমূহে গঙ্গা - ভাগীরথীকেই উত্তর রাঢ়ের উত্তর সীমা বলে ধার্য করা হয়েছে।

দক্ষিণ রাঢ়ের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ৯৮১ সালে বাক্পতি মুঞ্জের গৌঁওরী লিপিতে এবং ৯৯১ - ৯৯২ সালে রচিত শ্রীধরাচার্যের 'ন্যায় কন্দলী' গ্রন্থে। রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপিতে, একাদশ - দ্বাদশ শতকে রচিত কৃষ্ণ মিশ্রের 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটকে, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যে দক্ষিণ রাঢ়ের যে সমস্ত স্থানের কথা উল্লিখিত হয়েছে, সেগুলি বর্তমান হাওড়া, হুগলী ও বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। অতএব স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমান হাওড়া, হুগলী ও বর্ধমান জেলার অধিকাংশ স্থান দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত।

দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত হুগলী জেলা প্রথমে বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে শাসনকার্যের সুবিধার্থে বর্ধমান জেলাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় -- উত্তর ভাগ বর্ধমান জেলা এবং দক্ষিণ ভাগ হুগলী জেলা বলে পরিচিত হয়।

Under Regulation XXXVI of 1795, Zilla Burdwan was devided into two parts, each under a separate officer.

মাননীয় মিঃ সি. এ. ব্রুস এই জেলার প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন এবং ১৭৯৫ - ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি শাসনকার্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

সপ্তদশ শতকের বিভিন্ন গ্রন্থ এবং প্রথম ইংরেজ গভর্নর উইলিয়াম হেজেস -এর ডায়েরীতে হুগলী বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়েছে। যেমন - ওগোলি, ওগলি, গোলিন, হিউগলি, হাগলে, গুলি প্রভৃতি। কিন্তু ঠিক কোন্ সময় হুগলীর উৎপত্তি হয়েছিল তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। এসম্পর্কে একটি প্রচলিত ধারণা হল যে, সপ্তগ্রাম বন্দরে যাতায়াতের পথে পোর্তুগীজরা ভাগীরথী তীরস্থ একটি গ্রাম্য জনপদ দেখেছিল, যেখানে নদীর ধারে প্রচুর 'হোগলা' গাছ জন্মেছিল। নদীপথে যাতায়াতের সময় পাশের গ্রামের নাম জানতে চেয়েছিল হয়ত কোনও নাবিক। সাহেব নদীর তীরে হয়ে থাকা গাছের নাম জানতে চাইছে -- এমন ধারণা নিয়ে উত্তর দেওয়া হয়েছিল 'হোগলা'। তবে এ ধরণের কোনও ঘটনা ঘটেছিল কিনা সে সম্পর্কে উপযুক্ত কোনও তথ্যপ্রমাণ নেই।

হুগলী নামের ক্ষেত্রে অপর একটি ধারণা প্রচলিত আছে। পোর্তুগীজরা ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে গোলঘাট অঞ্চলে (বর্তমান হুগলী জেলখানা এলাকায়) একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিল। পোর্তুগীজ ভাষায় 'গোলা' শব্দের অর্থ দুর্গ প্রাচীরের বহির্দেশের উপর দিকের অংশ। সেদিক থেকে দুর্গ হওয়ার জন্য গোলঘাট নামও হতে পারে। হুগলী জেলার ইতিহাস রচয়িতাদের অন্যতম D. G. Crawford তাঁর 'A Brief History of the Hughli District' গ্রন্থে বলেছেন যে, গোলঘাট থেকে 'হুগলী' এসেছে। আবার পোর্তুগীজ বণিকরা পণ্য মজুত করার জন্য যে সকল গুদাম বা গোলা তৈরী করেছিল তা থেকে 'হুগলী' নামটি আসতে পারে। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের মতে পোর্তুগীজদের মুখের ভাষায় যা 'ও-গোলিম' বা 'ও-গোলি', বাঙ্গালী জিভে তা 'হুগলী' হয়েছে। তবে এই মত সমর্থন যোগ্য নয়। কারণ, গোলঘাট, গোল বা গোলা থেকে 'হুগলী'তে উত্তরণ সহজ ও স্বাভাবিক প্রক্রিয়া নয়, বরং এর বিপরীত প্রক্রিয়াই স্বাভাবিক।

তবে মুসলমান লেখকগণ বরাবরই এই প্রাচীন জনপদের নাম 'হুগলী' লিখেছেন। ১৫৯৬

খ্রীষ্টাব্দে রচিত আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে 'হুগলী' নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু এর অল্পদিন পরে রচিত পোর্তুগীজ লেখক ফারিয়া সৌজার বইতে 'গোলিন', ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লেখা হিউগেস ও পার্কার -এর চিঠিতে 'গোল্লিন', এমনকি ফরাসী পর্যটক বার্ণিয়ের লেখা 'Travels in the Mogul Empire' গ্রন্থেও 'ও-গোলি' ব্যবহৃত হয়েছে। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে আব্দুল হামিদ লাহোরী 'হুগলী' বন্দরের উল্লেখ করে সেখানে পোর্তুগীজ প্রাধান্যের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এর থেকে বলা যায় যে, প্রচলিত 'হুগলী' নাম থেকেই উচ্চারণ বিকৃত হয়ে বিদেশীদের লেখায় গোলিন, গোল্লিন বা ও-গোলি এসেছিল। তাই 'হুগলী' কোনও বিদেশীদের দেওয়া নাম নয়। শম্ভু চন্দ্র দে তাঁর 'Hooghly Past and Present' নামক গ্রন্থে এই মত পোষণ করেছেন। কবি বিপ্রদাস মনসার ভাষান সম্পর্কিত পুঁথিতে (১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে) হুগলীর কথা বলেছিলেন। পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন -- "Hooghly was even before the settlement of Portuguese, a place of some importance .... Bipradas who writes before the arrival of the Portuguese in India mentions it by the proper name Hughly."।

১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ শাহের প্রদত্ত সনদের দ্বারা পোর্তুগীজরা সপ্তগ্রামে ব্যবসা শুরু করলেও পলি জমে এই বন্দরের পতন অবশ্যম্ভাবী বুঝে তারা ভাগীরথী তীরস্থ হুগলীতে আসে এবং হুগলীকে নদী বন্দর হিসাবে গড়ে তোলে। ১৫৭৯ - ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগীজ নাবিক পেড্রো ট্যাভারেসকে সম্রাট আকবর যে ফরমান দান করেন তার দ্বারা পোর্তুগীজ শক্তি হুগলীতে কুঠি, বসতি ও ঘাঁটি স্থাপন করেছিল, যার ফলশ্রুতিতে হুগলী নদী বন্দর বঙ্গের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ প্রতিনিধি র‍্যালফ ফিচ হুগলীতে এসে সমগ্র হুগলী শহরকে পোর্তুগীজ শাসনাধীনে দেখেছিলেন। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগীজ বন্দর হুগলীতে কনভেন্ট ও তৎসংলগ্ন একটি গির্জা নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু সম্রাট আকবরের দেওয়া ফরমানের অপব্যবহার করে পোর্তুগীজরা বাণিজ্যের নামে দস্যুবৃত্তি, লুঠতরাজ এবং অরাজকতার সৃষ্টি করে, এমনকি তারা মোঘলদের প্রাপ্য রাজস্ব দেওয়াও বন্ধ করে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সম্রাট শাহজাহানের নির্দেশে তৎকালীন বাংলার শাসন কর্তা কাশিম খাঁ ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুন হুগলী শহর অবরোধ করেন। উভয়ের মধ্যে প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। পোর্তুগীজ

শক্তি পরাস্ত হলে বঙ্গদেশ থেকে পোর্তুগীজদের অবলুপ্তি ঘটে।

মোঘলদের হাতে পোর্তুগীজদের পতনের সুযোগ নিয়ে ওলন্দাজরা পার্শ্ববর্তী চুঁচুড়ায় আধিপত্য বিস্তার করে এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুখ্য ভুমিকা গ্রহণ করে। ওলন্দাজদের উপনিবেশ হিসাবে চুঁচুড়া প্রসিদ্ধ হয়। বর্তমানে হুগলী - চুঁচুড়া পৌরসভার পরিচালনাধীন হুগলী - চুঁচুড়া মিলিত শহর। 'The Imperial Gazetteer of India' তে W. W. Hunter লিখেছেন "Hugli and Chinsurah lie, infact, so close to each other as to form in reality only one town." 'Bengal District Gazetteers (Hooghly)' নামক সরকারী গ্রন্থে L. S. S. O'Malley ও Mon Mohan Chakravarti লিখেছেন — "Hooghly – Chinsurah was constituted a regular Municipality in 1865, and is now governed by the Bengal Municipal Act."

চুঁচুড়া শুধুমাত্র হুগলী জেলার সদর শহর নয়, প্রাচীন কাল থেকে এটি বর্ধমান বিভাগের হেড কোয়ার্টার ও ভুক্তিপতির কার্যালয় এবং বাসভবন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সদর শহর চুঁচুড়া কলকাতা থেকে প্রায় ২৫ মাইল দুরত্বে অবস্থিত। ভৌগোলিক দিক থেকে ২২° ৫৪' ৪৪" উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৮° ২৬' ২৮" পূর্ব দ্রাঘিমায় চুঁচুড়া অবস্থান করছে। উত্তরে হুগলী ছোঁয়া প্রতাপপুর, মল্লিক কাশেম হাট, নবাব বাগান, পূর্ব দিকে ভাগীরথী নদী, দক্ষিণে চন্দননগর, পশ্চিমে ধরমপুর -এর অংশ ও জি. টি. রোড। চুঁচুড়ার আয়তন প্রায় ১৭.৫ বর্গ কিমি।

দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'সুরধুনী' কাব্যে চুঁচুড়া সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

"চন্দ্রমা - মাধুরী ধরি চুঁচুড়া নগরী,
জল - কেলি - আশে যেন উপকুলোপরী,
সুরূপা রমণী এক ভঙ্গিমার সনে,
দাঁড়াইয়ে আভাময়ী সহাস - বদনে —
কাঞ্চন - কলস কক্ষে কালেজ ভবন,
পূর্বকালে প্রাণকৃষ্ণ - নৃত্য নিকেতন।

অপূর্ব উদ্যান - রাজি নয়ন রঞ্জন
যেন ব্রজে বনমালি - কেলি - কুঞ্জবন।
নবীন নবীন তরুপল্লব শ্যামল,
নগর - নগরী শিরে কুঞ্চিত কুন্তল।
ফুটেছে উদ্যানে ফুল শোভা আভাময়
মুকুতা কুন্তলে দোলে অনুভব হয়।''

আকবরের রাজস্বমন্ত্রী তোডরমল ষোড়শ শতকে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব নির্ধারণের জন্য সুবা বাংলাকে কয়েকটি সরকারে এবং ঐ সব সরকার গুলিকে আবার কতগুলি পরগনায় বিভক্ত করেন। চুঁচুড়া ঐ সময় 'সরকার সাতগাঁও' -এর অন্তর্গত 'আরসা' বা 'আর্যা' পরগনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্থানটি তখন 'কুলিহান্ডা' নামে পরিচিত ছিল। এই 'কুলিহান্ডা' পরবর্তীকালে 'ধরমপুরে' পরিণতি লাভ করে এবং 'ধরমপুর' বর্তমান হুগলী - চুঁচুড়া পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত একটি অঞ্চল।

'চুঁচুড়া' নামের উৎপত্তি নিয়ে যথেষ্ট মত পার্থক্য আছে। তবে সর্বাধিক যুক্তিগ্রাহ্য স্বীকৃত নাম হল ওলন্দাজদের দেওয়া 'চিনসুরা' নামটি। অনেকে আবার ইউরোপীয় পর্যটক সার্জন গার্সিন -এর দেওয়া চিঞ্চোরা নামটি গ্রহণযোগ্য বলেছেন। উইলিয়াম হেজেসের ডায়েরীতে এই শহরকে 'চিঞ্চোরা' বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন এখানে 'চাঁচড়া' নামে বেতের জঙ্গল ছিল, আবার কারও মতে তৎকালীন সময় ঐ জায়গায় 'চিনচিরা' ঘাসে পূর্ণ ছিল। সেই কারণেই ঐ স্থানের নাম এই রকম হয়েছে। 'চাঁচড়া' বা 'চ্যাচড়া' বেত বন থেকে চুঁচুড়া নামের উৎপত্তি অসম্ভব নয়। 'চুঁচুড়া' নামের শেষে 'ড়' ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে অষ্ট্রিক ভাষার দ্বারা প্রভাবিত। অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস 'বাংলা ভাষায় সাঁওতাল উপাদান' প্রবন্ধে বলেছেন যে, সাঁওতালিতে অড়া অর্থে গৃহ, আড়ড়া = আড় + অড়া -- প্রাচীর ঘেরা গ্রাম। উঁচু + অড়া, অর্থাৎ উঁচু গ্রাম থেকে চুঁচুড়ার উৎপত্তি অসম্ভব নয়।

আয়তনে চুঁচুড়ার আকৃতি ছিল ক্ষুদ্র। চুঁচুড়ার বাসিন্দা প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সমালোচক, নাট্যকার অক্ষয় চন্দ্র সরকার চুঁচুড়া নামের উৎপত্তি সম্পর্কে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে

বলেছেন -- "আমরা ক্ষুদ্র, চুঁচুড়া শব্দের অর্থই ক্ষুদ্র। শব্দের অর্থই বা কেন বলি? ক্ষুদ্র শব্দের রূপান্তরই 'চুঁচুড়া'। ক্ষুদ্র, ছুটর, ছটরা, ছোট, ছোকরা, ছুকরী, খুচর, খুচরা, করচা, চুঁচুড়া, কুর্চা, কচি -- এই সকল পদই ক্ষুদ্র শব্দজাত। "আমরা ক্ষুদ্র"। কিন্তু এই ব্যাখ্যা সর্ব সম্মত নয়।

কারও কারও ধারণা 'চুঁচুড়া' পোর্তুগীজ শব্দ। হুগলী কলেজের ইতিহাস প্রণেতা গিরিজা চরণ ঘোষ মহাশয় 'কলেজ বাড়ির ইতিকথা' গ্রন্থে 'চুঁচুড়া' নামটি কোনও দ্রাবিড় শব্দের অপভ্রংশ বলে উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন চুঁচুড়া সম্বন্ধে তথ্যাভিজ্ঞ এবং আধুনিক চুঁচুড়ার রূপায়ণে উদ্যোগী শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় মনে করেন 'চেন সায়ের' (Chain Sayer) শব্দ থেকে চুঁচুড়ার উৎপত্তি। খুব সম্ভবত চেন (Chain) আরবী শব্দ, এর অর্থ পদাতিক সৈন্য এবং সায়ের (Sayer) এর অর্থ সরাইখানা। বর্তমান তালডাঙ্গার কাছে গড়বাটীর দিকে বিস্তৃত জায়গায় ছিল এই সরাইখানা বা আধুনিক ব্যারাকের মত বাসস্থান। ইউরোপীয় বণিক ও পর্যটক ক্যাপ্টেন আলেকজান্ডার হ্যামিলটন "A New Account of the East Indies" গ্রন্থে চুঁচুড়াকে 'চিনচুরা' (Chinchura) বলে উল্লেখ করেছেন। "Prosperous British India" নামক গ্রন্থে ব্রিটিশ লেখক Witham Disby বলেছেন "The factory of the Christian French is situated in Chandannagar alias Farasdanga. Similarly at Chuchurah, the Dutch hold authority." অনেকে মনে করেন যে, এই অঞ্চলে উঁচু চুড়া ছিল এবং তার খন্ডিত রূপে লৌকিক উচ্চারণে চুঁচুড়া হয়েছে। কারণ এখানে তাঁরা গঙ্গার জল ঢুকতে দেখেননি। ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে লুই লিয়ের চুঁচুড়াকে 'চিঞ্চুরাৎ', ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজ ভ্যালেন্টাইন 'সিঞ্চেনু' বা 'সিন্টেনু' বলে অভিহিত করেছেন। Yule নামক এক ইংরেজ বলেছেন যে, এক ধরণের বস্ত্রের নাম ছিল চিনেচুরা, যা থেকে চিনসুরার নামকরণ হয়েছে।

শহর রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করার পূর্বে চুঁচুড়া সামান্য একটি পল্লীগ্রাম ছিল। জনবসতি ছিল অল্প। চাষবাস - কৃষিকার্য সেভাবে হতো না। সামান্য কিছু ব্যবসা বাণিজ্য ও রাজকার্যাদি সপ্তগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হতো। সপ্তগ্রাম বন্দরের পতনের পর সেখানকার সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায় কলকাতা, হুগলী ও চুঁচুড়াতে চলে আসেন। 'আইন - ই - আকবরী' তে সুবর্ণ বণিকদের 'আঢ্য' পদবীর উল্লেখ আছে।

চুঁচুড়ার আর্থ - সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে এদের অবদান উল্লেখযোগ্য। এরা স্বর্ণ - রৌপ্য আমদানী করত এবং এই ব্যবসা ছিল বংশানুক্রমিক। আঢ্য ছাড়াও এদের পদবী ছিল শীল, মল্লিক, লাহা, দত্ত, বড়াল ইত্যাদি। এছাড়া চুঁচুড়ার বিখ্যাত সোম পরিবার মোঘলদের অধীনে দেওয়ান নিযুক্ত হন এবং পরবর্তীকালে অনেকে ওলন্দাজদের রাজস্ব বিভাগে ও কাউন্সিলে নিযুক্ত হন। কলকাতার বিখ্যাত লাহা বংশ, শীল বংশ, দত্ত বংশ ছিল চুঁচুড়ার বংশোদ্ভুত কয়েকটি পরিবার। এই সমস্ত বংশ ইউরোপীয়দের সঙ্গেও ব্যবসা বাণিজ্য করত। নবশাক ব্যবসায়ীদের মধ্যে গন্ধবণিক, তাম্বুলিবণিক পরিবারও ছিল। 'আরসা' পরগণার অধীন এই ক্ষুদ্র গ্রাম ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হতে থাকে। এসম্পর্কে প্রচলিত ছড়া হলঃ

'উদিল শিব, ফুটিল শহর, লভিল চুঁচুড়া' নাম
হুগলীর সাথে যুক্ত সে যে বণিক সমাজ ধাম'।

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের 'Calcutta Gazette' এবং চারুচন্দ্র রায়ের লেখা 'শোভা সিংহের বিদ্রোহ' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ভারতের মধ্যে একমাত্র চুঁচুড়াতেই প্রাচীন কালে বরফ তৈরী হতো। এই দুর্লভ পদার্থ কুলিহান্ডা মহালের অন্তর্গত নফরডাঙ্গার মাঠে উৎপন্ন হতো।

গ্রামীন পরিবেশে বাঁচার তাগিদে মানুষ বিভিন্ন পেশা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। চুঁচুড়ার পাড়ার নামগুলি থেকেই তাদের পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজবিদরা এই জনবিন্যাসকে পেশাগত ও জাতিগতভাবে ভাগ করেছেন। H. H. Risely -এর গ্রন্থ 'The Tribes and Castes of Bengal' Vol. - II থেকে জানা যায় যে, হুগলী জেলার ৮২টি জাতি ও উপজাতির মধ্যে তাম্বুলী, মাল, কৈবর্ত্য, নাপিত, মালো, যুগী, কামার, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, শুঁড়ি, গোয়ালা, কুমোর, কাপালী প্রভৃতি সম্প্রদায় চুঁচুড়া ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বাস করত। কামারপাড়া, শুঁড়িপাড়া, জেলেপাড়া, গোয়ালটুলি যেমন পেশাগত নামকরণ, তেমনি যুগীপাড়া, কাজীপাড়া প্রভৃতি সম্প্রদায় বাচক এবং ফিরিঙ্গিটোলা, আরমানীটোলা, মোগলটুলী প্রভৃতি জাতিবাচক নামকরণ। ব্যবসাগত কারণে খড়ুয়াবাজার, ঘুঁটিয়াবাজার, মেছুয়াবাজার, আখন (আখনি বা মাংস) বাজার নামের প্রচলন। লোহাপট্টী, তুলাপট্টী, কাপাসডাঙ্গা উৎপন্ন দ্রব্য ও বিক্রয়স্থল থেকে এসেছে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, চুঁচুড়ার মানুষ ব্যবসা বাণিজ্য এবং এই সমস্ত বিভিন্ন

পেশা অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করত। তখন গ্রামে অনেক বড় গাছ ছিল, আর ছিল ঠাকুরের স্থান। তা থেকে তালডাঙ্গা, আমড়াতলাগলি, চাঁপাতলা, বেলতলা এবং বুনোকালীতলা, পঞ্চাননতলা, মনসাতলা, বুড়োশিবতলা ইত্যাদি নামকরণ হয়েছে।

চুঁচুড়া সংলগ্ন চন্দননগর, যার অবস্থান চুঁচুড়ার দক্ষিণ সীমায়, হুগলী জেলার একটি বিখ্যাত শহর। এই জেলার ৪টি মহকুমার মধ্যে চন্দননগর মহকুমার নাম উল্লেখযোগ্য। ভৌগোলিক দিক থেকে ২২° ৫০' ৩০" উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২২° ৫৩' ৩০" উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮° ২৩' ৩০" পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৮৮° ২১' ৩০" দ্রাঘিমায় চন্দননগরের অবস্থান। উত্তরে সংলগ্ন শহর চুঁচুড়া এবং দক্ষিণে ভদ্রেশ্বর, পূর্বে ভাগীরথী-হুগলী। জি. টি. রোড এই শহরকে মাঝখান দিয়ে দুভাগে ভাগ করেছে। পশ্চিম দিকে এখনও গতিবেগহীন সরস্বতী নদীর অস্তিত্ব আছে। এই শহরের আয়তন প্রায় ১৯.৬৬ বর্গ কি.মি.। এই স্থানটি মধ্যযুগে 'সরকার সাতগাঁও' এর 'বোড়োপরগণা'-র অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাক-ঔপনিবেশিক চন্দননগর বলতে সরস্বতী নদীর তীর বরাবর বেড়ে ওঠা গ্রাম গুলিকে বোঝাত। কারণ সরস্বতী তখন ছিল দুরন্ত বেগ সম্পন্না। আর অন্যদিকে ভাগীরথী ছিল ক্ষীণস্রোতা। দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে ছিল চন্দননগরের অবস্থান, যদিও প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে অঞ্চলটি চন্দননগর নামে পরিচিত ছিল না। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে সরস্বতী নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ার ফলে তার স্রোতধারা ক্ষীণ হয়ে আসে, অন্যদিকে ভাগীরথী বা হুগলী নদীর নাব্যতা বেড়ে যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে হুগলী নদীতে জাহাজ চলাচল শুরু হয়। চন্দননগরের ইতিহাস তাই হুগলী নদীর তীরবর্তী জনপদের সঙ্গে সরস্বতী নদীর তীরের জনপদগুলির সম্মিলিত সহাবস্থানের বিবরণ।

কিন্তু চন্দননগর নামের উৎপত্তি ও প্রাচীনত্ব সম্পর্কে এখনও কোনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। এমন কোনও উপাদান এখনও পাওয়া যায়নি যে যার সূত্র ধরে আমরা বলতে পারি প্রাক্-ঔপনিবেশিক আমলে অর্থাৎ ফরাসীদের আগমনের পূর্বে এই নাম প্রচলিত ছিল। প্রাথমিকভাবে এতথ্য জানা যায় যে, ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে নভেম্বর Francois Martin, André Boureau Deslandes এবং Pele তৎকালীন ফরাসী কোম্পানীর ডিরেক্টরকে যে চিঠি লেখেন সেখানে চন্দননগর নামের উল্লেখ আছে।

কিন্তু "Mémoires de Francois Martin (1665-1694)" তে বারবার হুগলীর নাম থাকলেও চন্দননগর নামের উল্লেখ কোথাও নেই। তবে 'Institut de Chandernagor' বা চন্দননগর মিউজিয়ামে ফরাসী শাসকদের নামের যে তালিকা আছে তাতে ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে নভেম্বর চন্দননগর নামের উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে। 'The Diaries of Streynsham Master' থেকে জানা যায় যে, ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ এজেন্ট Streynsham Master যখন হুগলীতে আসেন তখন তিনি হুগলীর অদূরে ওলন্দাজ ও ফরাসীদের কুঠি দেখতে পান। কিন্তু তাঁর বর্ণনায় তিনি চন্দননগর নামের উল্লেখ করেননি। ফাণ-ডেন-ব্রুক -এর মানচিত্রে চন্দননগরের নাম উল্লেখ থাকলেও তাতে চন্দননগরকে হুগলী নদীর অপর পারে দেখানো হয়েছে। এই অংশটি প্রক্ষিপ্ত বলেও জানা গেছে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের 'The Modern Review' পত্রিকায় প্রকাশিত হরিহর শেঠ ও নলিনীকান্ত গুপ্তর লেখায়।

কিছু পুরাতন গ্রন্থ ও নথিপত্রে বোড়ো, খলিসানী ও গোন্দলপাড়া এবং তার সংলগ্ন পাইকপাড়ার উল্লেখ থাকলেও চন্দননগরের নাম নেই। ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্রদাসের 'মনসা মঙ্গল' কাব্যে বোড়ো ও পাইক পাড়ার নাম পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে যে —

"ডাহিনে হুগলী রহে বামে ভাটপাড়া
পশ্চিমে রহিল বোড়ো পূর্বে কাঁকিনাড়া
মূলাজোড়, গাড়ুলিয়া, বাহিল সত্বর
পশ্চিমে পাইকপাড়া রহে ভদ্রেশ্বর"।

কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যে ভাগীরথীর তীরে গোন্দলপাড়ার উল্লেখ আছে। সুতরাং উপরোক্ত তথ্য থেকে খুব সহজেই বোঝা যায় যে, বোড়ো হলো সেই স্থান যা এখনও একই নামে পরিচিত এবং চন্দননগরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, আর বোড়ো কৃষণপুর বা কৃষ্ণপুর নামে পরিচিত। গোন্দলপাড়াও একই নামে আজও বর্তমান, যেটি এখন শহরের দক্ষিণে অবস্থিত এবং চন্দননগরের অন্তর্গত। 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে যে খুব প্রাচীনকালে একজন ধীবর রাজা খলিসানীতে বাস করতেন। এই

গ্রন্থে খলিসানী মহাগ্রামরূপে বর্ণিত হয়েছে। এই খলিসানীও বর্তমানে একই নামে পরিচিত এবং পশ্চিমদিকে অবস্থিত এই অঞ্চলটি চন্দননগরের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এর থেকে খুব স্বাভাবিকভাবে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, উপরোক্ত উপাদানগুলিতে বোড়ো, গোন্দলপাড়া ও খলিসানী নামের উল্লেখ থাকলেও চন্দননগরের উল্লেখ নেই। অর্থাৎ এই সময়কালে ওই এলাকাটিকে চন্দননগর নামে ডাকা হত না, অথচ এই তিনটি গ্রামের অস্তিত্ব ছিল। আর ফরাসী অধিকারে আসার পর এই তিনটি প্রধান গ্রাম নিয়েই গঠিত হয় চন্দননগর। এই গ্রামগুলি ছাড়াও চন্দননগরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পাইকপাড়া, সাবিনাড়া, চকনসীরাবাদ, গঞ্জসুখরাবাদ প্রভৃতি।

চন্দননগরের উৎপত্তি বিষয়ক সমস্যার সমাধান যেমন একটি বিতর্কিত বিষয়, তেমনি 'চন্দননগর'-এই নামটির উৎপত্তিও বিতর্কিত বিষয়। কীভাবে এবং কার দ্বারা নামটি প্রথম এল সে বিষয়েও সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। চন্দননগর নামের উৎপত্তি সম্পর্কে কয়েকটি দিক আছে। এ সম্পর্কে প্রথমেই বলা যায় যে, 'চন্দ্র' থেকে চন্দননগর নামের উৎপত্তি। 'প্রজাবন্ধু' পত্রিকায় উল্লেখিত হয়েছে যে, চন্দননগরের সমোন্নতি রেখা বক্রাকার, যা শিবের মাথায় থাকা অর্ধচন্দ্রের মতো। 'চন্দ্র' থেকে নামটি 'চন্দ্রনগর' এবং তা থেকে ক্রমশঃ চন্দননগর হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসে যে, এত চিন্তাভাবনা করেই যদি চন্দননগর নামটি এসে থাকে, তাহলে ওই সময়কার কোনো দেশীয় গ্রন্থে ওই নামটি স্থান পেল না কেন? এবিষয়ে আরও একটি মত প্রচলিত আছে যে, চন্দন গাছ এবং চন্দন কাঠের ব্যবসা থেকেই চন্দননগর নামের উৎপত্তি। আসলে চন্দন কাঠের একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ব্যবসা এখানে হত। তাছাড়া এখান থেকে লাল রঙের এক ধরণের কাঠ বিপুল পরিমাণে রপ্তানি হত। এই লাল কাঠ লাল চন্দনও হতে পারে। উপরন্তু রুদ্র নামে নদীয়ার এক ধার্মিক রাজা হুগলী সন্নিহিত অঞ্চল থেকে চন্দনকাঠ পেয়েছিলেন বলেও জানা যায়। শম্ভুচন্দ্র দে দৃঢ়ভাবে জানিয়েছেন যে, এক সময় ওই এলাকায় প্রচুর পরিমাণে চন্দনকাঠ উৎপাদিত হতো। সুতরাং 'চন্দন' থেকে চন্দননগর হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও কয়েকটি প্রশ্ন এসে যায় যে — চন্দনকাঠের ব্যবসা যখন শুরু হয় তখন চন্দননগর নামটি প্রচলিত ছিল। তাছাড়া চন্দনগাছের জঙ্গলের কোনো প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক বিবরণ পাওয়া যায়নি। উপরন্তু, বাণিজ্য সম্ভারের মধ্যে চন্দন কাঠ থাকলেও এটিই একমাত্র উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য পণ্য ছিল না। একটি মাত্র বাণিজ্য

পণ্যকে কেন্দ্র করে একটি নগরের নাম হওয়া সম্ভব নয়। চন্দননগর নামের উৎপত্তির ক্ষেত্রে এধারণাও প্রচলিত আছে যে, চন্দ্র বংশীয় রাজার অবস্থান থেকে চন্দননগর নাম হয়েছে। কিন্তু চন্দ্র বংশের রাজার কোনও অস্তিত্ব এখনও পাওয়া যায়নি। শুধু মাত্র চন্দ নামক কয়েকটি বর্ধিষ্ণু পরিবার চন্দননগরে আছে।

চন্দননগর নামটি কে প্রথম দিয়েছিলেন তাও সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়নি। কেউ কেউ বলেন যে, চন্দননগরের ফরাসী গভর্নর André Boureau Deslandes এই নামটি দিয়েছিলেন। কারণ ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এবং Francois Martin ও Pelé তৎকালীন ফরাসী গভর্নরকে যে চিঠি লেখেন, তাতেই প্রথম চন্দননগর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। যদি এমন হয় যে, চন্দননগর নামটি ফরাসী অধিকারের সময় থেকে প্রচলিত হয়ছিল, তাহলে এ বিষয় সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যুক্তিসঙ্গত হবে যে, এই নামটি ফরাসীদের মধ্যে থেকেই কেউ একজন প্রথম দিয়েছিলেন। তিনি Deslandesও হতে পারেন।

চন্দননগর আবার ফরাসডাঙ্গা নামেও পরিচিত। অবশ্য ফরাসীরা আসার পর থেকে এই নামটি চালু হয়। যদিও ফরাসডাঙ্গা বলতে সমগ্র চন্দননগরকে বোঝাত না, ফরাসীদের এক্তিয়ারভুক্ত অঞ্চল এই নামে পরিচিত ছিল। 'ডাঙ্গা' বলার কারণ হলো যে, ফরাসীদের অধিগৃহীত অঞ্চলটি উচ্চভূমিতে অবস্থিত ছিল। পশ্চিমদিকের অঞ্চলটি ছিল জলাভূমি এবং নীচু। তাই ফরাসীরা যখন অঞ্চলটির দখল নেয়, তখন তা স্বাভাবিকভাবেই ফরাসীডাঙ্গা হয়, যা পরবর্তীকালে ফরাসডাঙ্গায় পরিণত হয়। লর্ড ক্লাইভ এই অঞ্চলটিকে এক সময় 'France-dongy' বলেছেন। এটা ফরাসডাঙ্গার আরেকটি অপভ্রংশ।

খলিসানী, বোড়ো, গোন্দলপাড়া, পাইকপাড়া, চকনসীরাবাদ ইত্যাদি পুরানো অঞ্চলগুলি ছাড়াও ফরাসীদের দুর্গ নির্মাণের পর চন্দননগরের ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে। তার সঙ্গে বাড়তে থাকে জনসংখ্যা। এই জনসংখ্যা ছিল মিশ্র প্রকৃতির। দুর্গে বিভিন্ন জাতির সৈন্যরা ছিল এবং বিভিন্ন ধরণের কাজকর্মের জন্য ভিন্ন পেশার মানুষ এখানে আসত। কেউ ফরাসী কোম্পানীতে চাকরী করতে এসেছিল, আবার কেউ বাণিজ্যের প্রয়োজনে এসেছিল। তাঁতী, কুমোর, ছুতোর ইত্যাদি পেশার মানুষের সংখ্যা চন্দননগরে বাড়তে থাকে। ফলে চন্দননগরে নানা পাড়ার উদ্ভব হয়। যেমন - কুমোরপাড়া, তাঁতীপাড়া, ছুতোরপাড়া ইত্যাদি।

পেশাগত ও উপাধিগত নামে ছিল হালদারপাড়া, বোসপাড়া ইত্যাদি। তাছাড়া দত্ত, রক্ষিত, কুন্ডু , দে, ভড়, শেঠ, নন্দী প্রভৃতি পরিবারগুলি চন্দননগরে এসে ব্যবসা শুরু করে। এখানে প্রথমদিকে ব্রাহ্মণদের অস্তিত্ব প্রায় ছিল না বললেই হয়। যোশেফ ফ্রাঁসোয়া দুপ্লে আসার পর বহু ব্রাহ্মণ পরিবার এখানে আসতে থাকে। ব্রাহ্মণদের আগমণের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা নেন ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। বাণিজ্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চন্দননগরে আরও পাড়া বাড়তে থাকে। এই পাড়াগুলির নাম কখনও গাছের নাম দিয়ে আবার কখনও দেবতার নাম দিয়ে গড়ে ওঠে। এই সব পাড়ার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ষষ্ঠীতলা, অশ্বত্থতলা, মনসাতলা, লিচুতলা ইত্যাদি। আবার উচ্চ অঞ্চলগুলি ডাঙ্গা নামে পরিচিত হয়। যেমন - ফরাসডাঙ্গা, দিনেমারডাঙ্গা, তালডাঙ্গা, হরিদ্রাডাঙ্গা, মহাডাঙ্গা ইত্যাদি। এগুলির পাশাপাশি পুকুরের নামেও বহু অঞ্চল বিখ্যাত হয়ে গেছে। যেমন - পদ্মপুকুর, হেলাপুকুর, কলুপুকুর ইত্যাদি। আবার বোড়ো অঞ্চলের পাড়াগুলির প্রত্যেকটির সঙ্গে বোড়ো কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন - বোড়ো দিঘীরধার, বোড়ো চাঁপাতলা, বোড়ো পঞ্চাননতলা প্রভৃতি। এইভাবে নিস্তরঙ্গ চন্দননগরের ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে এবং জনবিন্যাস পাল্টে যায়।

এতক্ষণ আমরা সাধারণভাবে চুঁচুড়া ও চন্দননগর সম্পর্কে অবহিত হলাম। এবার আমরা ওলন্দাজ শাসনাধীন চুঁচুড়া ও ফরাসী শাসনাধীন চন্দননগরের বাণিজ্য - অর্থনীতি, প্রশাসন ও রাজনৈতিক সম্পর্ক, স্থাপত্য শৈলী, সামাজিক মেলামেশা , বিনোদন ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করব। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের গবেষণার এই বিষয়টিকে আমরা দুটি পর্বে ভাগ করে আলোচনা করতে চাই। প্রথম পর্বে আমরা ওলন্দাজ শাসনাধীন চুঁচুড়ার আর্থ - সামাজিক দিকটি তুলে ধরতে চাই এবং দ্বিতীয় পর্বে ফরাসী শাসনাধীন চন্দননগরের আর্থ - সামাজিক দিক সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই।

## ঃঃ প্রথম পর্ব ঃঃ

### প্রথম অধ্যায় ঃ ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও বাংলার বাণিজ্য অর্থনীতি —

ওলন্দাজরা কী উদ্দেশ্য নিয়ে এবং কখন ভারতবর্ষে এল, চুঁচুড়াকে কেন্দ্র করে বাংলায় কীভাবে

তারা বাণিজ্যিক আধিপত্য গড়ে তুলল, বাংলার কোন্ কোন্ অঞ্চলে তাদের ঘাঁটি ছিল ইত্যাদি ছাড়াও ওলন্দাজ বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য পণ্যদ্রব্যগুলি এবং তাদের বাণিজ্যের লাভ - লোকসানের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়ে। এছাড়াও তৎকালীন দেশীয় শক্তির সঙ্গে ওলন্দাজদের আর্থিক বোঝাপড়ার বিষয়টিও আলোচনা করা হয়েছে এখানে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এবং চুঁচুড়ার প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক সম্পর্ক —

চুঁচুড়া তথা সমগ্র বাংলার বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য ওলন্দাজরা কী ধরণের প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, প্রশাসনে কোন্ ধরণের কর্মচারী নিয়োগ করা হত, প্রশাসনে কোনও বিভাগ ছিল কিনা, দেশীয় শক্তির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তারা কী ধরণের নীতি গ্রহণ করেছিল, বিদেশী, বিশেষতঃ ইংরেজদের সঙ্গেই বা তাদের কী ধরণের সম্পর্ক ছিল, সর্বোপরি এই দীর্ঘ সময় তাদের রাজনৈতিক উত্থান - পতন ইত্যাদি বিষয় এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ ওলন্দাজ আমলে চুঁচুড়ার স্থাপত্য শৈলী, বিনোদন ও সামাজিক মেলামেশা —

চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদের স্থাপত্য শৈলীর কোন্ কোন্ নিদর্শনের কথা জানা যায়, তাদের প্রাত্যহিক ও পারিবারিক জীবন কেমন ছিল, সমাজে কোন্ শ্রেণীর সঙ্গে তাদের মেলামেশা ছিল, চুঁচুড়ার স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল কিনা, তাদের ধর্মীয় জীবন কেমন ছিল, ওলন্দাজ ও বাঙালী উভয় সংস্কৃতির প্রভাবে চুঁচুড়ায় মিশ্র সংস্কৃতি গড়েউঠেছিল কী না ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

## ঃঃ দ্বিতীয় পর্ব ঃঃ

চতুর্থ অধ্যায় ঃ চন্দননগরে ফরাসী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক উত্থান —

ভারতবর্ষ তথা বাংলায় ফরাসীরা কীভাবে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলল, চন্দননগরে কখন

ফরাসীরা এল, তারা কখন কুঠি স্থাপন করল, চন্দননগরকে কেন্দ্র করে কীভাবে তাদের বাণিজ্যিক উত্থান ঘটল, বাংলার কোন্ কোন্ অঞ্চলে তারা ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল, ফরাসী বাণিজ্যের মুখ্য পণ্যদ্রব্যগুলি কী ছিল ইত্যাদি সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ চন্দননগরে ফরাসীদের দুর্গনির্মাণ এবং প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপ ও রাজনৈতিক সম্পর্ক —

চন্দননগরে ফরাসীরা কেন দুর্গ নির্মাণ করল, বাণিজ্য পরিচালনার জন্য তারা কী ধরণের প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, তাদের প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপ কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হত, প্রশাসন ব্যবস্থায় স্তর বিভাজন কীভাবে হত, প্রশাসনে কোন্ ধরণের কর্মচারী নিয়োগ করা হত, চন্দননগরের স্থানীয় অধিবাসীরা প্রশাসনিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে পারত কী না ইত্যাদি বিষয় আলোচনা জরুরী। ইংরেজ ও ওলন্দাজদের সঙ্গে বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল কী না ইত্যাদি সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ চন্দননগরে ফরাসীদের স্থাপত্য কর্ম, ধর্ম চর্চা, সামাজিক মেলামেশা ও বিনোদন —

চন্দননগরে ফরাসীরা কী ধরণের স্থাপত্য নিদর্শন গড়ে তুলেছিল, ধর্মীয় ব্যাপারে তাদের চিন্তাধারা কী ছিল, চন্দননগরে ফরাসীদের সামাজিক জীবন কেমন ছিল, সমাজে তাদের মেলামেশার পরিধি কতটা বিস্তৃত ছিল, চন্দননগরের স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের কতটা মেলামেশা ছিল, সর্বোপরি তাদের বিনোদনের জগৎ কেমন ছিল ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে।